থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি আকাশের পরে হয়েছে বলে বোঝা যায় না। বরং এর অর্থ ভূমণ্ডলের বিন্যাস ও পরিপূর্ণতা সাধন এবং তা থেকে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন-সংক্রান্ত বিস্তারিত কাজ নভোমণ্ডল সৃষ্টির পরেই সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য মূল পৃথিবীর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই সাধিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে আকাশের সংখ্যা সাত বলে প্রমাণিত। এতে বোঝা যায় যে, জ্যোতির্বিদগণের মতানুসারে আকাশের সংখ্যা ৯ হওয়ার তথ্য সম্পূর্ণ ভুল, অমূলক ও নিছক কল্পনাপ্রসূত।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ
أَنۢبِـُٔونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَٰنَكَ
لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ
أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُل
لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ্-

তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ (সে সব ছাড়া)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি এবং সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর?

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে (প্রস্তাবিত বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে বললেন যাতে বিশেষ তাৎপর্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল, নতুবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে তো আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ পবিত্র। মোট কথা, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে) বললেন, অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (অর্থাৎ, সে আমার এমন প্রতিনিধি হবে যার উপর আমি শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করব)। ফেরেশতারা বলতে লাগলেন, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে শুধু কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? পরন্তু আমরা নিরন্তর আপনার প্রশংসাস্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনা করে যাচ্ছি। (ফেরেশতাদের এ উক্তি প্রতিবাদছলে বা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তাঁরা যে কোন উপায়ে একথা অবগত হয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত নব সৃষ্ট জাতি মাটির উপকরণে তৈরী হবে এবং তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীই থাকবে।

সুতরাং কেউ কেউ প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। তাই তাঁরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, আমরা তো সবাই যে কোন দায়িত্ব পালনে সদাপ্রস্তুত। বস্তুত ফেরেশতাকুলে পাপী বলতে কেউ নেই। অনন্তর নতুন কর্মচারী বাড়ানোর অথবা নতুন জাতি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন—বিশেষত যেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রস্তাবিত এ নব জাতি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে? আমরা তো যে কোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের খেদমত পুরোপুরি আপনার মত ও মর্জি মোতাবেক হবে।) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, তোমরা যা

জান না আমি তা জানি। তিনি আদমকে (সৃষ্টি করার পর তাঁকে) যাবতীয় বস্তুর নামের জ্ঞান দান করেন। (অর্থাৎ, সব বস্তুর নাম, বৈশিষ্ট্যাবলী ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান আদম [আ]-কে দান করলেন।) অতঃপর সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, তবে তোমরা আমাকে এসব বস্তুর নাম (যাবতীয় নিদর্শনাদি ও গুণাবলীসহ) বলে দাও দেখি! যদি তোমরা (তোমাদের এ বক্তব্য যে, তোমরাই বিশ্ব-প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে) সত্য হয়ে থাক। ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, আপনি অতি পবিত্র। (অর্থাৎ,—এ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যে, আপনি আদম [আ]-এর সামনে জ্ঞান রহস্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের সামনে তা গোপন রেখেছেন। কেননা, কোরআনের কোন আয়াত বা হাদীসসূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম [আ]-কে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা করে উল্লেখিত বস্তুসামগ্রীর নাম ও গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সবার সামনে একই রকমের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত আদম [আ]-এর মধ্যে মজ্জাগতভাবে সে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ছিল বলে তিনি তা আয়ত্ত করে নেন। অপরপক্ষে ফেরেশতাদের সে যোগ্যতা না থাকার দরুন তাঁরা তা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি।) আপনার প্রদত্ত জ্ঞান ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নেই। আপনি মহাজ্ঞানী ও সর্বাধিক হেকমতের অধিকারী। (তাই তিনি যার জন্য যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি কল্যাণকর বলে মনে করেছেন, তাকে ততটুকুই দিয়েছেন। প্রতিনিধির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ফেরেশতাগণ যে অক্ষম, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের একথার স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত আদম [আ] যে যথার্থই এ বিশেষ জ্ঞান লাভের যোগ্য, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছেন।) এরশাদ করেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব বস্তুর নাম (সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাদিসহ) বলে দাও। (যখন হযরত আদম [আ] এ সব কিছু ফেরেশতাদের সামনে সবিস্তারে বলে দিলেন, তখন তাঁরা বুঝে নিলেন যে, হযরত আদম [আ] এ বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।) অতঃপর (যখন হযরত আদম [আ] তাঁদেরকে এসব বস্তুর নাম বলে দিলেন,) তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় অদৃশ্য (বস্তুর রহস্য সম্পর্কে) অবগত এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর বা অন্তরে গোপন রাখ তাও আমার জানা?

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ও সাধারণ অনুগ্রহরাজির বর্ণনা দিয়ে মানবকে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে রুকূর শেষ পর্যন্ত দশটি আয়াতে এ সূত্র ধরেই হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অনুগ্রহ দু'ধরনের ঃ

(১) প্রকাশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যথা, পানাহার, অর্থ-কড়ি, ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি। (২) আভ্যন্তরীণ বা অতীন্দ্রিয়। যথা, মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি ; জ্ঞান-বুদ্ধি, আনন্দস্ফূর্তি প্রভৃতি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অনুগ্রহাদির বিবরণ। আলোচ্য এগারটি আয়াতে আভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে জ্ঞান ও বিদ্যাবলে ধনী করেছি এবং ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করিয়ে বিশেষ গৌরব ও অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। আর তোমাদেরকে তাঁরই বংশধর হওয়ার গৌরব দান করেছি।

এ আয়াতের সার-সংক্ষেপ এই---মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁরা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতি-গত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়--- তাঁরা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক তা আল্লাহ্ পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও। তা কেবল আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত।

অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে। ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত ফেরেশতাগণের এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই।

**আদম সৃষ্টি প্রসংগে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ** একথা বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ্ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো ?

একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, নিজস্ব

অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানীগুণীর সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ্ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত---যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ পাকই সবকিছুর স্রষ্টা এবং মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তাঁর অধীনস্থ ও আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আল্লাহ্ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

সার কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন আবশ্যকতাও নেই। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন, কোরআন পাকে রসূলে করীম (সা)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতি প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের ভাষার ইঙ্গিতে বোঝা যায় আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশ-তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ পাক তাদের চাইতে জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না।

তফসীরে ইবনে জরীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا ولا اعلم (আল্লাহ্ পাক আমাদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল ও জ্ঞানী কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না।) কেবল আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানই ছিল যে, এমন এক সৃষ্টি করতে হবে, যা

সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে এবং যাকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের গৌরবে ভূষিত করা হবে।

এজন্য ফেরেশতাদের আসরে পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধিরূপে হযরত আদমের সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল, যাতে তারা এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে।

সুতরাং ফেরেশতাগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বিনীতভাবে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করে নিবেদন করলেন--মহাপ্রভু, আপনি মর্ত্যলোকে যে জাতিকে আপনার প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, তার মাঝে দ্বন্দ্বকলহ সৃষ্টি, অকল্যাণ ও অহিত সাধনের উপকরণও তো বিদ্যমান। সে নিজেই যখন রক্তপাত ঘটাবে, তখন সে অপরকে কিভাবে সংশোধন করবে এবং বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলাই বা কিভাবে বিধান করতে পারবে? পক্ষান্তরে আপনার ফেরেশতাকুলে দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কোন উপকরণ নেই। তারা যাবতীয় পাপ-পংকিলতা বিমুক্ত এবং সর্বক্ষণ আপনার গুণগান ও উপাসনা-আরাধনায় নিয়োজিত। দৃশ্যত তারাই এ খেদমত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

মোট কথা, এদ্বারা আল্লাহ্ পাকের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। কেননা, ফেরেশতাগণ এমন মন-মানসিকতা ও অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। একথা জানাই তাদের উদ্দেশ্য যে, কোন্ হেকমত ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে এবং কি কল্যাণ চিন্তায় এমন এক নিষ্কলুষ পূত-পবিত্র একান্ত অনুগত সম্প্রদায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অপর এক পংকিল জাতি সৃষ্টি করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে একাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে?

এর উত্তর দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রথমত সংক্ষিপ্তভাবে বলেন ঃ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (তোমরা যা জান না আমি তা জানি।) অর্থাৎ তোমরা খেলাফতে এলাহীর নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকেফ-হাল নও। তাই তোমরা মনে কর যে, কেবল এক নিষ্পাপ জাতিই সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন ও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এর পুরো তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত রহস্য শুধু আমিই অবগত।

অতঃপর ফেরেশতাগণকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সৃষ্ট জগতের সমগ্র বস্তু-সামগ্রীর নাম, এদের গুণাগুণ ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞানলাভের যোগ্যতা কেবল আদম সন্তানকেই দান করা হয়েছে। ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতি মোটেও এর উপযোগী নয়। এসব কিছু আদম (আ)-কে শিখিয়ে ও বলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্বের উপকারী ও ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রী এবং তার লক্ষণাদি ও বৈশিষ্ট্যাবলী, প্রত্যেক প্রাণী সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি ও লক্ষণা-বলী---এ সবের জ্ঞানলাভের যোগ্যতা ফেরেশতাকুলের নেই। ফেরেশতারা কি বুঝবেন

যে, ক্ষুধা কি জিনিস, পিপাসার যন্ত্রণা কেমন, মানসিক উত্তেজনা ও প্রেরণার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি, বস্তুতে মাদকতার উৎপত্তি কেমন করে হয়, কোন্ ধরনের এবং কোন্ রাশির শরীরে সাপ ও বিচ্ছুর বিষের প্রতিক্রিয়া কি রকম হয়?

মোট কথা সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও লক্ষণাদির জ্ঞান ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ শিক্ষা ও জ্ঞান শুধু আদমকেই দেয়া সম্ভব ছিল এবং তাঁকেই তা দেয়া হল। কোরআন পাকের কোথাও সরাসরিভাবে বা আকার-ইঙ্গিতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম (আ)-কে ফেরেশতাদের থেকে পৃথক করে কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং এমন হতে পারে যে, শিক্ষাদান এবং তা গ্রহণের সুযোগ সবার জন্যে সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। এদ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা হযরত আদম (আ)-এর ছিল বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি এ শিক্ষা লাভ করে নেন। ফেরেশতাদের প্রকৃতিতে তা ছিল না বলে তাঁরা তা লাভ করতে সক্ষম হননি। এজন্যই এখানে শিক্ষাদানকে শুধু আদম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ (এবং আল্লাহ্ পাক হযরত আদমকে শিক্ষা প্রদান করেন) অবশ্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা আদম (আ) ও ফেরেশতা উভয়ের জন্য সমভাবেই ছিল এবং উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে শিক্ষাদানের কোন আয়োজনই করা হয়নি। বরং আদম (আ)-কে সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে এসব দ্রব্য-সামগ্রীর জ্ঞান স্বভাবগতভাবেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই মায়ের দুধ পান করতে এবং হাঁসের ছানা সাঁতার কাটতে জানে। এ ব্যাপারে কোন বাহ্যিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন হতে পারে ---আল্লাহ্ তো সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি ফেরেশতাদের প্রকৃতি ও স্বভাব পাল্টিয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদেরকেও এসব কিছু শিখিয়ে নিতে পারতেন। তবে তা করলেন না কেন? উত্তর এই যে, যদি ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হতো তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতাই থাকতেন না, মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন। সুতরাং এ প্রশ্নের অর্থ পরোক্ষভাবে এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে মানুষে রূপান্তরিত করছিলেন না কেন?

সার কথা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বস্তু-সামগ্রীর নাম এবং সেগুলোর গুণাগুণ ও লক্ষণাদির বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যা ফেরেশতাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। অতঃপর সেসব বস্তু-সামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে

বলা হল, তোমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি হবে না বলে এবং বিশ্ব খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মানব জাতির চাইতে তোমরাই যোগ্যতর বলে তোমাদের যে ধারণা এতে তোমরা যদি সত্যবাদী ও সঠিক হয়ে থাক, তবে সৃষ্ট জগতের যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্ব-খলীফার শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে, যাবতীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীসহ এগুলোর নাম বলে দাও দেখি!

এখানে এ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলো যে, শাসকের জন্য শাসিতের স্বভাব-প্রকৃতি গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় তিনি তাদের ওপর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না। যে ব্যক্তি জানে না যে, ক্ষুধার কারণে কিভাবে কতটুকু কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়, তার আদালতে যদি কাউকে অভুক্ত রাখা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তবে সে এর কি মীমাংসা করবে এবং কিভাবে করবে?

মোট কথা, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের পূর্বেকার অমূলক ধারণার অপনোদন করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিষ্পাপ হওয়াই যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়, বরং দেখতে হবে, সে বস্তু জগত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল কিনা এবং সেগুলোর ব্যবহারবিধি ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে কিনা। যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে যে, তোমরা (ফেরেশতাগণ) এ খেদমতের জন্য যোগ্যতর তবে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ এসব বস্তুর নাম বলে দাও।

যেহেতু ফেরেশতাদের মতামত প্রকাশ কোন প্রতিবাদছলে বা অহংকার প্রদর্শনার্থ অথবা তাদের যোগ্যতার দাবী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাদের অভিমতের অভিব্যক্তি ছিল একান্ত আনুগত্য কর্মচারীর ন্যায় এবং বিনীতভাবে নিজস্ব খেদমত পেশ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন। ---'মহান প্রভু, আপনি অতি পবিত্র। আপনি যতটুকু জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কিছুই আমাদের জানা নেই।' যার মর্মার্থ হল, নিজেদের পূর্ববর্তী ধারণা পরিত্যাগ করে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তাদের চাইতে অধিক প্রজ্ঞাবান উত্তম জাতিও রয়েছে এবং খেলাফতের জন্য তারাই যোগ্যতম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন---পৃথিবীতে পদার্পণ করে মানব জাতি যে পরস্পর রক্তারক্তি করবে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটাবে ফেরেশতাগণ এ তথ্য কোথা থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করলেন? তাদের কি অদৃশ্য জ্ঞান ছিল? না নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এর উত্তর এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং তার ভাবীকালের সম্ভাব্য কার্যকলাপ, আচার-

ব্যবহার ও গতিবিধির স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন। যেমন, কোন কোন হাদীসে পাওয়া যায়, যখন আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আদম সৃষ্টির বিবরণ ফেরেশতাদের সামনে প্রদান করলেন, তখন ফেরেশতাগণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট ভাবী খলীফার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে সবকিছু সবিস্তারে বলে দেন। ফেরেশতাগণ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তারক্তি করাই যে জাতির বৈশিষ্ট্য, তাকে কোন্ যুক্তি ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করা হলো?

এর একটি উত্তরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত আদমের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আর বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাবে বলে তাঁর খেলাফতের যোগ্যতা প্রসংগে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, সংক্ষিপ্তাকারে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ— (তোমরা যা জান না নিশ্চয়ই আমি তা জানি।) আয়াতের মাধ্যমে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বিষয়কে তোমরা খেলাফতের যোগ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করছ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই তার যোগ্যতার মূল উৎস ও প্রধান কারণ। কেননা, অশান্তি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই বিশ্ব-খেলাফত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। যেখানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থাকবে না, সেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর কি প্রয়োজন? মোট কথা, আল্লাহ্ পাক নিজের ইচ্ছানুসারে একদিকে যেমন নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদের দ্বারা কোন পাপই সংঘটিত হতে পারে না, অপরদিকে তেমনি শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের কোন পুণ্য ও কল্যাণকর কার্য সাধনের যোগ্যতাই নেই। অনুরূপভাবে এমন এক জাতি সৃষ্টি করাও আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় ছিল, যার মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের সমাবেশ ঘটবে এবং যার মাঝে মঙ্গল-অমঙ্গল উভয় প্রেরণাই বিদ্যমান থাকবে এবং মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি বিধানের গৌরবে ভূষিত হবে।

**ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ঃ** আদম (আ)-এর এ বর্ণনায় বস্তু-সামগ্রীর নাম শিক্ষা দানের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাষা শব্দাবলীর মূল প্রণেতা ও স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। অতঃপর সৃষ্টির নানা রকম ব্যবহারের ফলে তা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ইমাম আশ্আরী (র) এ আয়াতেই প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকই ভাষার প্রণেতা।

**ফেরেশতাদের ওপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ** এ ঘটনার ক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমে ব্যবহৃত এসব বিশুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দসমষ্টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু-সামগ্রীর নাম বলে দাও, তখন أَنبِئُونِي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ—আমাকে বলে দাও। আবার যখন হযরত আদম (আ)-কে একই বিষয় সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়েছে, তখন أَنبِئْهُم (হে আদম তাদেরকে বলে দাও।) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদম (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতাদেরকে এসব বস্তুর নাম বলে দাও। প্রকাশভংগীর এ পার্থক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে হযরত আদম (আ)-কে শিক্ষকের এবং ফেরেশতাদেরকে শিক্ষার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যেখানে হযরত আদম (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এক বিশেষ ভংগীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। কেননা, যেসব বস্তুর জ্ঞান তাদের ছিল না, আদম (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে কোন না কোন পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব বস্তুর জ্ঞানদান করা হয়েছে।

**পৃথিবীর খেলাফত ঃ** এ সব আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং সেখানে আল্লাহ্ পাকের বিধি-বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হল এই যে, গোটা বস্তুজগত ও নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই জন্য। কোরআন মজীদের বহু আয়াত একথা প্রমাণ করে। যেমন— إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (বিধান দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক।) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁরই।) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (জেনে রেখো, তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা।) প্রভৃতি আয়াত। পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন ঘটেছে। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের অনুমতিক্রমে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা এবং মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্বভার গ্রহণ করে খোদায়ী বিধান প্রবর্তন করেছেন। খলীফার এ নিযুক্তি সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে হয়। এক্ষেত্রে কারো চেষ্টা-তদ্‌বীর ও শ্রম-সাধনার

কোন দখল নেই। এজন্যই গোটা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা বা বিশ্বাস রয়েছে যে, নবুয়ত লাভ চেষ্টা-তদবীরলব্ধ কোন বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ পাকেই নিজস্ব ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এ কাজের জন্য বেছে নিয়ে তাঁদেরকে নবী-রসূল বা খলীফা নিযুক্ত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন জায়গায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ (আল্লাহ্ পাক ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে আপন রসূল বেছে নেন।) اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (কাকে রিসালতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন, আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।)

এসব খলীফা সরাসরি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যাবতীয় নির্দেশ ও বিধান-মালা প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বে তা প্রবর্তন করেন। খোদায়ী খেলাফতের এ ধারা আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হুযুরে পাক (সা) পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। নবীকুল শিরমণি হুযুরে পাক (সা) বিশেষ গুণাবলী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ সর্বশেষ খলীফারূপে দুনিয়ার বুকে তশরীফ আনেন। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ সম্প্রদায় বা অঞ্চল বিশেষের জন্য প্রেরিত হতেন। তাঁদের খেলাফতের পরিধি ও শাসনক্ষমতা সেসব নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ও অঞ্চলসমূহের মধ্যেই গণ্ডীভূত থাকত। হযরত ইবরাহীম (আ) এক সম্প্রদায়ের প্রতি, হযরত লূত (আ) অপর এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-ও এঁদের মধ্যবর্তী নবীগণ বনী-ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

**বিশ্বের সর্বশেষ খলীফা হুযুরে পাক (সা) ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ** নবী করীম (সা) গোটা বিশ্ব ও মানব-দানব, তথা গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার সারা বিশ্বের উভয় জাতির উপর পরিব্যাপ্ত ছিল। কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতে তাঁর নবুয়তকে বিশ্বব্যাপী বলে ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

(আপনি ঘোষণা করে দিন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্ পাকের রসূল। আর আল্লাহ্ পাক হলেন সেই মহান সত্তা, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যাঁর কর্তৃত্বাধীন।)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন, ছ'টি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক আমাকে অন্য নবীগণের ওপর বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

১. আমাকে সমগ্র বিশ্বের নবী ও রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন।

২. পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত যেমন বিশেষ সম্প্রদায় ও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল এক নির্দিষ্ট যুগের জন্য। পরবর্তী নবী বা রসূলের আবির্ভাবের সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীর খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটত এবং পরবর্তী নবীর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হত। আমাদের রসূল (সা)-কে আল্লাহ্ পাক খাতামুল-আম্বিয়া-রূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁদের প্রবর্তিত শরীয়ত ও বিধান-মালা কিছু কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ও কার্যকরী থাকত। ধীরে ধীরে নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে তা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে উপনীত হত। ফলে সে সময়ে অন্য রসূল বা নবী প্রেরণ করা হত।

আমাদের রসূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রবর্তিত বিধান ও শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত থাকবে। তাঁর ওপর অবতারিত কোরআন মজীদের (শব্দ ও অর্থ) সব কিছু হেফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

(নিশ্চয় আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমি তার রক্ষণা-বেক্ষণকারী।)

অনুরূপভাবে হুযুর পাক (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালার সমষ্টি হাদীস-শাস্ত্রের সংরক্ষণের জন্যও আল্লাহ্ পাক এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি উম্মতের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল বর্তমান রাখবেন, যারা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালাকে প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় বলে মনে করবে। তারা তাঁর পরিত্যক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, আদর্শ ও শরীয়তী নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানুষের দ্বারে পৌঁছাতে থাকবে। কোন শক্তি বা ব্যক্তি এদলকে বিনষ্ট ও স্তব্ধ করতে পারবে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অদৃশ্য মদদ থাকবে।

সার কথা, পূর্ববর্তী নবীগণের গ্রন্থসমূহ ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিভিন্ন-ভাবে অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত অথবা ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় টিকে থাকত। কিন্তু হুযুর (সা)-এর ওপর নাযিলকৃত কোরআন

এবং তাঁর বাণীর সমষ্টি হাদীস সব কিছুই সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। এজন্যই এ বিশ্বে তাঁর পরবর্তী সময়ে কেয়ামত পর্যন্ত না কোন নবী রসূলের প্রয়োজন আছে, না আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধি আগমনের অবকাশ আছে।

পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত বহাল থাকত। প্রত্যেক নবী-রসূলের অন্তর্ধানের পর পরবর্তী নবী (খলীফা) আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হতেন এবং খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন।

কিন্তু হুযুর (সা)-এর খেলাফতকাল কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত মূলত তিনিই বিশ্বে আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর তিরোধানের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হবেন, তিনি রসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে—হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَّاِنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ-

(অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলের নবীগণই রাজত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এক নবীর তিরোধানের পর অপর নবীর আগমন হতো। আর জেনে রেখো, আমার পরে কোন নবী-রসূল আসবে না। অবশ্য খলীফাগণের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক।)

(৫) তাঁর পরে আল্লাহ্ পাক তাঁর উম্মত সমষ্টিকে এমন মর্যাদা দান করবেন, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দেওয়া হত অর্থাৎ সমস্ত উম্মতকে নিষ্পাপ ও নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, তাঁর উম্মত কখনো বিপথ ও ভ্রান্ত নীতির উপর একত্র হবে না। গোটা উম্মত যে বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করবে, তা খোদায়ী বিধান ও সিদ্ধান্তেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হবে। এজন্যও আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র পর মুসলিম উম্মতের সম্মিলিত মতকে শরীয়তে দলীলের তৃতীয় ভিত্তি বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

لَنْ يَّجْتَمِعَ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ (আমার উম্মত কখনও ভ্রান্ত নীতির ওপর একত্র হবে না।) এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে ঃ আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের ওপর অটল থাকবে। দুনিয়ার যত পট পরিবর্তনই হোক, সত্য যতই নিষ্প্রভ ও দুর্বল হয়ে পড়ুক, কিন্তু

আল্লাহ্‌র পথে সর্বতোভাবে নিবেদিত উম্মতের একদল সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পোষকতা করতেই থাকবে। এতে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সমগ্র উম্মত কখনো অসত্য ও ভ্রান্তির ওপর একত্র হবে না। আর যখন উম্মতের সমষ্টিকে নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তখন রসূলের খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতাও সমষ্টিগতভাবে উম্মতের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। হুযূরে পাক (সা)-এর পরবর্তীকালে বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রপরিচালনা ও আইন-শৃংখলা বিধানের দায়িত্বে সমাসীন করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। উম্মত যাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করবে, তিনি রসূলের খলীফা হিসেবে দেশের আইন-শৃংখলা বিধানের জন্য এককভাবে দায়ী থাকবেন। আর সমগ্র বিশ্বের খলীফা মাত্র একজনই হতে পারেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগ পর্যন্ত খিলাফতের এ ধারা সঠিক নিয়মে অভ্রান্ত নীতির ওপর চলে আসছিল। এ কারণেই তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ কেবলমাত্র ধর্মীয় ও সাময়িক সিদ্ধান্তের মর্যাদাই রাখে না, বরং তা এক সুদৃঢ় ও অভ্রান্ত সনদ এবং উম্মতের জন্য এক মৌলিক বিধান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এরশাদ করেছেন ঃ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين- (তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন যাপন পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর।)

**খিলাফতে রাশেদার পরবর্তী অবস্থা ঃ** খোলাফায়ে রাশেদীনের (ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা চতুষ্টয়) পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিশৃংখলা ও দুর্বলতার সুযোগ উম্মতের মধ্যে অনেক্য ও মতভেদের সূচনা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আমীর তথা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউই খলীফার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁদেরকে বড়জোর কোন অঞ্চল ও সম্প্রদায়বিশেষের আমীর (শাসক) বলা যেতে পারে। এরূপভাবে যখন কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলিম জগতের ঐক্য ও সংহতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল এবং প্রতিটি দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হল, তখন মুসলমানগণ ইসলামী নীতি অনুসারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সমর্থনপুষ্ট ও সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন যার সমর্থনে কোরআনের আয়াত وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।) পেশ করা যেতে পারে।

**পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা ( পরামর্শ ) নীতির পার্থক্য ঃ** বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইন-পরিষদগুলো এই কর্মপদ্ধতিরই এক নমুনা। পার্থক্য শুধু এই যে, গণতান্ত্রিক দেশের আইন-পরিষদগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে থাকে। নিছক নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ভাল-মন্দ, কল্যাণজনক বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাই এর রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন পরিষদ ( মজলিসে শূরা ), তার সদস্যমণ্ডলী এবং নির্বাচিত আমীর সবাই সে মৌলিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে রসূলের মাধ্যমে লাভ করেছেন। এ পরিষদ বা মজলিসে শূরার সদস্যপদ লাভের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে এবং এ পরিষদ যাকে নির্বাচিত করবে, তার জন্যও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের আইন প্রণয়নের কাজও কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত নীতিমালা আওতাধীনে সম্পন্ন করতে হবে। এর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের নেই।

সার কথা, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে যে এরশাদ করেছেন, "আমি বিশ্বের বুকে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব"---এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কতকগুলো মৌলিক ধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো এই ঃ

(১) নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্।

(২) পৃথিবীতে খোদায়ী বিধান ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য তাঁর রসূলই হবেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, খোদায়ী খিলাফতের ধারা যখন হুযুরে পাক (সা)-এর পরেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, সুতরাং হুযুরের ওফাতের পর বর্তমান খলীফাই রসূলের খিলাফতের ধারার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তিনি গোটা মিল্লাতের ভোট ও মতামতের মাধ্যমেই মনোনীত হবেন।

---

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

---

**(৩৪) এবং যখন আমি হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে ( নির্দেশ ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।**

**তফসীরের সারসংক্ষেপ**

এবং আমি যখন সমস্ত ফেরেশতাকে (এবং জ্বিন্ জাতিকে) নির্দেশ করলাম, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। মোট কথা, এদের সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হল ঃ আদম (আ)-এর সামনে সিজদায় পতিত হও। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পতিত হলো। আর সে নির্দেশ পালন করল না এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে গেল। (ফলে) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী ঘটনানুসারে ফেরেশতাদের চাইতে হযরত আদম (আ) অধিক মর্যাদার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন দলীলাদির দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, খেলাফতের যোগ্যতা লাভের জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, তা সবই আদম (আ)-এর রয়েছে। তবে এর কোন কোন জ্ঞান ফেরেশতাদেরও রয়েছে। কিন্তু জ্বিন জাতি সেসব জ্ঞানের অত্যন্ত নগণ্য অংশই লাভ করেছে। এ সম্পর্কে উপরে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম (আ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট। এখন আল্লাহ্ পাক এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জ্বিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলাম ঃ তোমরা আদমকে সিজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সিজদায় পতিত হল, কিন্তু ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠল।

**সিজদার নির্দেশ কি জ্বিনদের প্রতিও ছিল?** এ আয়াতে বাহ্যত যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, আদম (আ)-কে সিজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হল যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সিজদা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হল যে, সিজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও জ্বিন জাতি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হল যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

যখন তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হল, তাতে জ্বিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

**সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য বৈধ থাকলেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছেঃ** এ আয়াতে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভাইরা মিসর পৌঁছার পর হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, সিজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী। কোনকালে কোন শরীয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না, প্রাচীনকালের সিজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকু-সিজদা ও নামাযের মত করে হাত বেধেঁ দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক্, কুফর ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু কাজ এমনও রয়েছে যা মূলত শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত কার্য শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কার্য পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না, বরং সেগুলোকে শিরকরূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হত মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা মূলত কুফর বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ- (এবং জ্বিনেরা তার জন্য বড় বড় মিহ্রাব তৈরী করত এবং ছবি অংকন করত।)

অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শিরক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পথেই নবীগণের দ্বীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবী ও শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরীয়ত—রসূলে করীম (সা)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি থেকে বাঁচাবার জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিরক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ শরীয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগ শিরক ও প্রতিমা-পূজার উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা একই কারণে হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে সব সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শিরকের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হুযুর (সা) মানবদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের গোলামকে 'আব্‌দ' অর্থাৎ দাস বলে না ডাকে এবং গোলামদের প্রতি নির্দেশ দেন, যেন তারা মনিবদেরকে 'রব' বা প্রভু বলে না ডাকে। অথচ শাব্দিক অর্থে 'আবদ' অর্থ গোলাম এবং 'রব' অর্থ লালন-পালনকারী। এ ধরনের শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নিছক এ কারণে যে, এসব শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তীকালে এসব শব্দের কারণেই মনিবদেরকে পূজা করার পথ খুলে যেতে পারে; কাজেই এসব শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সার কথা আদম (আ)-এর প্রতি ফেরেশতা ও জিনদের সিজদা এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইদের সিজদা—যার বর্ণনা কোরআন পাকে রয়েছে, সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা ছিল—যা তাদের শরীয়তে সালাম, মুসাফাহা এবং হাতে চুমো খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত ও বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীকে পরিপূর্ণভাবে শিরকমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এ শরীয়তে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অপর কাউকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা বা রুকূ করাকেও অবৈধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কতক উলামা বলেছেন, ইবাদতের মূল যে নামায তাতে চার রকমের কাজ-

রয়েছে। যথা—দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা করা। তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে ইবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকু-সিজদা এমন কাজ যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্য এ দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে ইবাদতের পর্যায়-ভুক্ত করে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে তা করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজদায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সিজদার বৈধতার প্রমাণ তো কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি?

উত্তর এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর অনেক 'মোতাওয়াতের' ও মশহুর হাদীস দ্বারা সেজদায়ে-তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজদায়ে-তা'জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম কিন্তু এই শরীয়তে সিজদায়ে তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়।

এই হাদীস বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাদরীবুররাবী"-তে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশজন সাহাবী নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে মোতাওয়াতেরার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যা (হাদীসে মোতাওয়াতের) কোরআন পাকের ন্যায়ই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য।

**মাস'আলা ঃ** ইবলীসের কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া কোন কর্মগত নাফরমানীর কারণে ছিল না। কেননা, কোন ফরয কার্যগতভাবে পরিত্যাগ করা শরীয়তের বিধানানুযায়ী পাপ হলেও কুফরী নয়। ইবলীসের কাফির হয়ে যাওয়ার মূল কারণ ছিল আল্লাহ্ পাকের হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করা। অর্থাৎ—তিনি (আল্লাহ্) যার প্রতি সিজদা করতে আমাকে হুকুম করেছেন, সে আমার সিজদা লাভের যোগ্যই নয়, এমন হঠকারিতা নিঃসন্দেহে কুফরী।

**মাস'আলা ঃ** এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, ইবলীস তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান গরিমার দৌলতে ফেরেশতাদের শিরোমণি ও ওস্তাদ বলে আখ্যায়িত হয়েছিল। তার দ্বারা এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ কিভাবে সম্ভব হলো? কোন কোন উলামা বলেছেন যে, তার গর্ব ও অহংকারের দরুন আল্লাহ্ পাক নিজ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবুদ্ধির মহাসম্পদ প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সে এ ধরনের অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাজনিত কাজ

করে বসে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইবলীস খ্যাতির মোহ ও আত্মম্ভরিতার কারণে সত্যোপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও এই দুর্ভোগ ও অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছিল। তফসীরে রুহুল মা'আনী-তে এ প্রসংগে একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার সার সংক্ষেপ এই যে, "কোন কোন সময় কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ পাকের সাহায্য-সহানুভূতি মানুষের সাথ ছেড়ে দেয়। তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও প্রত্যেকটি কাজ তাকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়।"

উক্ত তফসীর দ্বারা একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের সে ঈমানই নির্ভর-যোগ্য ও ফলদায়ক যা শেষ জীবন ও পরকালের প্রথম ঘাঁটি (কবর) পর্যন্ত সাথে থাকে। সুতরাং উপস্থিত ঈমান, আমল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ওপর আনন্দিত ও গর্বিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾
فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا
اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

**(৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (৩৬) অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

এবং আমি (হযরত) আদম (আ)-কে তাঁর স্ত্রীসহ বেহেশতে বসবাস করতে নির্দেশ দিলাম। (যে স্ত্রীকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরতে হযরত আদমের পাঁজর থেকে

নেওয়া কোন উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন।) অনন্তর তোমরা এখানে যা চাও যেখান থেকে চাও স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে থাক, কিন্তু ও গাছের নিকটেও যেও না। অন্যথায় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। (সেটা কি গাছ ছিল, আল্লাহ্ পাকই জানেন। যাক তা থেকে বারণ করা হয়েছিল। আর প্রভুর এ ক্ষমতা থাকে যে, নিজ বাড়ীর যে সব জিনিস অনুগত দাসকে ভোগ করতে দিতে চান ভোগ করতে দেন এবং যা না চান তা থেকে বারণ করেন।) অতঃপর সে গাছের কারণে শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করে দিল এবং তাঁরা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন তা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দিল। অনন্তর আমি তাদেরকে নীচে নেমে যেতে বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে। তোমাদের এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং কাজকর্ম চালাতে হবে। (অর্থাৎ, সেখানেও স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না। কিছুকাল পর সে অবস্থান ছাড়তে হবে।)

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

এটা আদম (আ)-এর ঘটনার সমাপ্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব খিলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আ) এবং তাঁর সহধর্মিনী হাওয়া (আ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নেয়ামত পরিতৃপ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এর কাছেও যেও না। অর্থাৎ সেটির ভোগ পূর্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আ)-এর কারণে ধীকৃত ও অভিশপ্ত হয়েছিল। যে কোন প্রকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে তাঁদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের বিচ্যুতির দরুন তাঁদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে বসবাস জান্নাতের মত নির্ঝন্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটবে। ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না।

وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (এবং আমি আদম (আ)-কে সস্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম।) এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সেজদার পরবর্তী ঘটনা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি ও সেজদার ঘটনা জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল; এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সেজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু তাঁদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘটনার পর শোনানো হলো।

رَغَدًا — وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا আরবী অভিধান অনুযায়ী নেয়ামত ও আহার্যবস্তু বলতে সেই সব নেয়ামত ও আহার্যবস্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রমসাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশংকাই থাকে না। অর্থাৎ— আদম ও হাওয়া (আ)-কে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ — কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল যে, এর নিকটে যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন মুফাসসির সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, আঞ্জীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ অর্থাৎ—যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا — أَزَلَّ শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করেছিল বা তাঁদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ-সব শব্দে পরিষ্কার এ-কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের হুকুম লংঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না বরং শয়তানের প্রতারণায়

প্রতারিত হয়েই তাঁরা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যখন সেজদা না করার কারণে শয়তানকে অভিশপ্ত করে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হলো তখন আদম (আ)-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কিভাবে সে বেহেশতে পৌঁছলো? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, শয়তানের প্রতারণার এবং বেহেশতে পৌঁছার অনেক রূপ হতে পারে। হয়ত সাক্ষাৎ ব্যতীতই তাঁদের অন্তঃকরণে প্রবঞ্চনা ঢেলে দিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে, শয়তান জ্বিন জাতি-ভুক্ত বলে আল্লাহ্ পাক তাকে এমন সব কাজের ক্ষমতা দান করেছেন, যা সাধারণত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাদের বিভিন্ন আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। হতে পারে, দানবীয় ক্ষমতাবলে বা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে আদম ও হাওয়ার মনকে প্রভাবান্বিত ও প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত করে ফেলেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য কোন রূপে—যেমন, সাপ প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করে শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। সম্ভবত এ কারণেই তার শত্রুতার প্রতি হযরত আদম (আ)-এর কোন লক্ষ্যই ছিল না। কোরআন মজীদের আয়াত وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ- (শয়তান তাঁদেরকে কসম করে বলল যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণকামী ও সদুপদেশদানকারী।) এ আয়াত দ্বারাও একথাই বোঝা যায় যে, শয়তান শুধু প্রবঞ্চনা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আদম ও হাওয়াকে মৌখিক কথার মাধ্যমে এবং কসম দিয়ে দিয়েও প্রভাবিত করেছে।

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ —অর্থাৎ—শয়তান এই প্রবঞ্চনা ও পদস্খলনের দ্বারা আদম ও হাওয়া (আ)-কে সেসব নেয়ামতাদি থেকে পৃথক করে দিল, যেগুলোর মাঝে তাঁরা অতি স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করছিলেন। এই বের করা যদিও আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু এর কারণ যেহেতু ছিল শয়তান, সুতরাং বের করাকে শয়তানের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ —অর্থাৎ, 'আমি তাদেরকে হুকুম করলাম তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে।' এ নির্দেশে হযরত আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে সময় পর্যন্ত যদি শয়তানকে

আসমান থেকে বের করে না দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ এই যে, শয়তানের সাথে তোমাদের শত্রুতা দুনিয়াতেও সমভাবেই বলবৎ থাকবে। আর যদি এ ঘটনার পূর্বেই শয়তান বিতাড়িত হয়ে থাকে, তবে বাক্যের সম্বোধন আদম ও হাওয়া (আ) এবং তাঁদের বংশধরদের প্রতি হবে। যার অর্থ হবে এই যে, তাঁদের এক শাস্তি তো এই হল যে, তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো। এরই সাথে দ্বিতীয় শাস্তি এই যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা থাকবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিরাজ করলে পিতা-মাতার বেঁচে থাকার আকর্ষণ বিদায় নেয় এবং জীবনের মাধুর্য লোপ পায়। তাই এটাও এক প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্ত্বিক শাস্তি। وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ অর্থাৎ—আদম ও হাওয়ার প্রতি এরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে হবে এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। কিছুকাল পর এ অবস্থানও ছেড়ে যেতে হবে।

### উল্লেখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট মাস'আলা ও শরীয়তের বিধান

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ —(তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক।) এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানোর কথা বলা হয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবেও বলা যেতো اُسْكُنَا الْجَنَّةَ (আপনারা উভয় বেহেশতে বসবাস করুন। যেমন, এর পরে كُلَا এবং لَا تَقْرَبَا -এর মধ্যে দ্বিবচনমূলক একই ক্রিয়ায় উভয়কে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতভাবে اَنْتَ وَزَوْجُكَ শব্দসমূহ গ্রহণ করে প্রত্যক্ষভাবে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে যে, আপনার স্ত্রীও যেন জান্নাতে বসবাস করেন। এ দ্বারাও দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমত স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর, দ্বিতীয়ত বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অধীন। যে বাড়ীতে স্বামী বসবাস করবে, সে বাড়ীতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিত।

**মাস'আলা ঃ** اُسْكُنْ শব্দে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সে সময়ে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতবাস ছিল নিতান্তই সাময়িক; ফেরেশতাদের মত স্থায়ী

ছিল না। কেননা, اُسْكُنْ শব্দের অর্থ, সে বাড়ীতে বসবাস করতে থাক। তাঁদেরকে একথা বলা হয়নি যে, এ বাড়ী তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো, সুতরাং এটা তোমাদেরই বাড়ী। কারণ, একথা আল্লাহ্ পাকের জানা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের আবাস পরিত্যাগ করতে হবে। অধিকন্তু জান্নাতের অধিকার ঈমান এবং সৎকর্মের বিনিময়ে লাভ করা যায়, যা কিয়ামতের পরে হবে। এর দ্বারা ফকীহগণ এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে, আমার বাড়ীতে বসবাস করতে থাক বা আমার এ বাড়ী তোমার বাসস্থান, তবে এর ফলে সে ব্যক্তির জন্য বাড়ীর স্বত্ব বা স্থায়ী অধিকার লাভ হয় না।

**খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী নয়ঃ** وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

অর্থাৎ—'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাও-দাও।' এখানে পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়নি, বরং উভয়কে একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত করে كُلَا (উভয়ে খাও) বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী ও অধীন নয়। স্বামী যেমন নিজস্ব ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা মত খাবার ব্যবহার করবে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করবে।

**যে কোন স্থানে চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকারঃ**

رَغَدًا—رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا শব্দে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ—যে জিনিস যত ইচ্ছা খেতে পার। শুধু একটি গাছ ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। شِئْتُمَا শব্দের দ্বারা স্থান ও জায়গার ব্যাপকতা ও পর্যাপ্ততা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ—সমগ্র জান্নাত যেখানে খুশী, যেমন করে খুশী ভোগ করবে। গমনাগমনে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গতিবিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে নিজের প্রয়োজনাদি মেটাবার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। যদি একটা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট বাড়ী বা জায়গায় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, কিন্তু সেখানে থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকে, তবে তাও এক প্রকারের বন্দীদশা। এজন্য হযরত আদম (আ)-কে খাওয়া-পরার যাবতীয় বস্তু প্রচুর ও পর্যাপ্ত

পরিমাণে দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়নি, বরং حَيْثُ شِئْتُمَا (যেখানে এবং যত ইচ্ছা) বলে তাদেরকে চলাফেরা এবং সর্বত্র যাতায়াতের স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে।

**মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ঃ** وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ—"এ গাছের ধারেকাছেও যেও না।" এ বারণের ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়াই ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতাসূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্-শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাস'আলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ—কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় سد ذرائع (উপকরণের নিষিদ্ধতা) বলা হয়।

**নবীগণের নিষ্পাপ হওয়াঃ** এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

কারণ, নবী (আ)-দেরকে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবীদের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত এবং তাঁরা আস্থাভাজন থাকতেন না। যদি নবীদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দ্বীন ও শরীয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বোঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবী (আ) জেনেশুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত—এবং তা ক্ষমাযোগ্য। শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাকের দরবারে নবীদের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদরা বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

১. হযরত আদম (আ)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও এক খণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বস্তু দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট যে, হুযুর (সা)-এর হাতের ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় তাঁর হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ)-এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, নিষেধের সম্পর্ক শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে, "যেহেতু আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব, আমি তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।"

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে ঢেলে দিয়েছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনাপর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন---সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কোরআন মজীদের فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (অর্থাৎ, আদম [আ] ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকল্পের] দৃঢ়তা পাইনি।) আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যা হোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সার কথা এই যে, হযরত আদম (আ) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেন নি, বরং তিনি ভুল করেছিলেন বা তাঁর ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর শানে-নবুয়ত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম (আ)-কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল। কারণ শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার ও অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি

দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আ) বুঝতেই পারেন নি যে, সে'ই শয়তান।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

**(৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, অনন্তকাল সেখানে থাকবে।**

**তফসীরের সারসংক্ষেপ**

অতঃপর হযরত আদম (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, (অর্থাৎ বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশক বাক্য যা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন। হযরত আদম [আ]-এর অনুশোচনার কারণে আল্লাহ্ পাকের রহমত ও কৃপাদৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং তিনি নিজেই বিনয় ও প্রার্থনারীতি-সম্বলিত বাক্যাবলী তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।) তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর দিকে করুণার সাথে লক্ষ্য করলেন। আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে তওবা কবুলকারী এবং অতি মেহের-বান। (হযরত হাওয়া [আ]-এর তওবার বিবরণ সূরা আ'রাফে বর্ণিত রয়েছে।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا-তাঁরা উভয়ে বললেন. হে মহান পরওয়ারদেগার, আমরা

নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি) এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তিনিও তওবা ও তওবা কবুলের ক্ষেত্রে হযরত আদমের সাথে শরীক ছিলেন। কিন্তু ক্ষমা করার পরেও পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ রহিত হলো না, তাতে বহু রহস্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল। অবশ্য এর রূপ পাল্টে গেল। কেননা প্রথমবারে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শাসকোচিত —শাস্তিরূপে। আর এবারকার নির্দেশ ছিল অসীম তত্ত্ব ও রহস্যবিদ ও মহাজ্ঞানীসুলভ পদ্ধতিতে। তাই এরশাদ হলো, 'আমি তাঁদের সবাইকে জান্নাত থেকে নিচে নেমে যেতে বললাম। পরে যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কোন শরীয়তী বিধানমালা) পৌঁছে, তখন যে ব্যক্তি আমার এ হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই এবং পরিণামে এরা সন্তাপগ্রস্ত হবে না।' (অর্থাৎ তারা কোন ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হবে না। অবশ্য কেয়ামতের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যেমন, সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের ভয় ও ত্রাস সাধারণভাবে সবার উপরই নিপতিত হবে। কোন বিপদাপদে আক্রান্ত হলে মনের যে অবস্থা হয়, তাকে حزن [হুযন] বলা হয়। আর حزن [ভয়] সর্বদা বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে সঞ্চারিত হয়। এখানে আল্লাহ্ পাক ভয় ও সন্তাপ উভয়ই নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা, তাদের উপর এমন কোন বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হবে না, যার কারণে তারা ভীত বা শংকাগ্রস্ত হতে পারে।) আর যারা কুফরী করবে এবং আমার বিধানমালাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এবং অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শয়তানের প্রবঞ্চনা, হযরত আদম (আ)-এর পদস্খলন এবং পরিণতিস্বরূপ জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশের বিবরণ ছিল। হযরত আদম (আ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির সম্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না যে, বেমালুম তা সয়ে যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু নবীসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা ভিক্ষা মর্যাদার পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শাস্তি ও কোপানলের কারণরূপে পরিগণিত হতে পারে এমন আশংকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী

এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে স্বতঃপ্রণো হয়ে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা প্রার্থনারীতিসম্বলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ তাঁদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা-ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান।) কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক রহস্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল---যেমন, তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি---'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম-স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা, বিশ্বে খোদায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছবে, যা ফেরেশতাদের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছিল।

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহা-জ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ এবং পৃথিবীতে আগমন খোদায়ী খেলাফতের সম্মানসূচক। পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য পৃথি-বীতে অবতরণের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নিচে নেমে যেতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন পথ-নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তপ্ত হবে। (অর্থাৎ কোন অতীত বস্তু হারাবার গ্লানি থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টের আশংকা থাকবে না।)

تَلَقَّى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাঁদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمَاتٍ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সির সাহাবীদের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

تَوْبَة ــ تَابَ (তওবা)-এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি ঃ

১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা।
৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। অতীতের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বর্তমানে তা পরিহার করা এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প গ্রহণ---এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশ না ঘটা পর্যন্ত তওবা হবে না। تَابَ عَلَيْهِ -এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতামাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ) নিবেদন করেছিলেন--- رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে

ক্ষমা করুন।) হযরত ইউনুস (আ) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি বা ত্রুটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমত কোরআন করীম তার সম্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে। বলা হয়েছে, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا (অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্খলিত করে দেয়)।

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমকেও হযরত হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে, اِهْبِطُوا (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবুলের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যত্রও এ পদস্খলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ عَصٰى اٰدَمُ অর্থাৎ আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লংঘন করলেন।

এর কারণ হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর উল্লেখ করেন নি। এক জায়গায় উভয়ের তওবারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। رَبَّنَا ظَلَمْنَا... (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি।) এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁর (হাওয়ার) উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। (কুরতুবী)

**'তওয়াব' ও 'তায়েবের' পার্থক্য ঃ** ইমাম কুরতুবীর মতে تَوَّابٌ (তাওয়াব) শব্দের সম্বন্ধ মানুষের সাথেও হতে পারে, যেমন, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন।) এবং আল্লাহ্র সাথেও হতে পারে। যেমন, هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (তিনিই মহান, তওবা কবুলকারী,

অতি দয়ালু।) যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়, পাপ থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ হয় তওবা কবুল করা। সমার্থবোধক অপর শব্দ تَائِبٌ-এর ব্যবহার আল্লাহ্ পাকের ক্ষেত্রে জায়েয নয়। যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়, কিন্তু আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে শুধু সে সমস্ত গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়।

**তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নেই ঃ** এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রীস্টান ও ইহুদীরা এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলের শিকার হয়ে পড়েছে। তারা পাদ্রী পুরোহিত-দের কাছে গিয়ে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র কাছেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁরা বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

**আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয়, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য ঃ** قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেই-জন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের পদগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক ও খলীফা হিসাবে। এটা সে হিকমত ও রহস্য,

আদম সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সাথে যার আলোচনা করা হয়েছিল অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তাঁর খলীফা পাঠাতে হবে।

**শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত ঃ**

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের আশংকা নেই এবং কোন চিন্তাও করতে হবে না।) এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমত তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْفٌ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম। আর حُزْنٌ বলা হয় কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এ-দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের এক বিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর ন্যায় لَا حُزْنٌ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত হেদায়েত-সমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তাঁরা ছাড়া অন্য কোন মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোন বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোন। কেননা এঁদের মধ্যে কেউই এমন নন, যাঁর স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুখীন হবেন না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবেন না। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র ওলীগণ নিজের ইচ্ছা-আকাংক্ষাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন মজীদের অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে

দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন।) এতে বোঝা গেল যে, এ দুনিয়ায় কোন-না-কোন চিন্তা থাকা মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবী। শুধু তাঁরাই এর ব্যতিক্রম, যাঁরা আল্লাহ্ পাকের সাথে নিজেদের সম্পর্ক পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় করে নিয়েছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ওয়ালাদের যাবতীয় ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার অর্থ, পার্থিব কোন কষ্ট বা আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক হবে না। পরকালের চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহ্র ভয় তো অন্যদের চাইতে তাঁদের আরো বেশী হয়ে থাকে। এজন্য হুযুরে পাক (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত থাকতেন। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা পার্থিব বস্তু হারাবার কারণে বা কোন বিপদের আশংকায় ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহ্র ভয় ও উম্মতের কারণে।

এতে একথা বোঝা যায় না যে, দুনিয়াতে যেসব জিনিসকে ভয়ংকর বলে মনে করা হয়, সেগুলো মানবিক রীতি অনুসারে নবী ও ওলীগণের স্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক করবে না। কেননা যখন মূসা (আ)-র সামনে লাঠি সাপের রূপ ধারণ করল, তখন তাঁর ভয় পাওয়ার কথা কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ←(হযরত মূসার মনে ভয়ের সঞ্চার করল)। কেননা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত এ ভয় মূসা (আ)-র মধ্যে প্রথম অবস্থাতেই ছিল। যখন আল্লাহ্ পাক বললেন, لَا تَخَفْ (ভয় পেও না), তখন সে ভয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেল।

অবশ্য এ ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ)-র এ ভয় সাধারণ মানুষের ভয়ের মত এ কারণে ছিল না যে, সাপ কোন কষ্ট দিতে পারে, বরং এ কারণে ছিল যে, না জানি বনী ইসরাঈল এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ভয়ও পরকাল সংক্রান্তই ছিল। শেষ আয়াত وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا (এবং যারা কুফরী করেছে) -এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত হেদায়েতের অনুসরণ করবে না। অনন্তকালের জন্য তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। এর উদ্দেশ্য সে সব লোক, যারা এ হেদায়েতকে হেদায়েত মনে করতে বা তার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে অর্থাৎ—কাফেরগণ। কেননা মু'মিনগণ যারা হেদায়েতকে হেদায়েত বলে মনে করে তারা কার্যত যত পাপীই হোক, নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করে অবশেষে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٤٠ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۠ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۝٤١ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤٢

(৪০) হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য বক্তা হিসাবে তোমাদের কাছে। বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। (৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

হে বনী-ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের সন্তানগণ)! তোমরা আমার অনুকম্পাসমূহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি, (যাতে নেয়ামতের হক অনুধাবন করে ঈমান গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এ স্মরণ করার মর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর (অর্থাৎ তওরাত গ্রন্থে তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, যার বর্ণনা কোরআনের এ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا

[এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম]। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব। (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি

তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলাম—যেমন উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আছে لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো] এবং শুধু আমাকেই ভয় কর। এ কথা ভেবে (সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, তাদের ভক্তি না থাকলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।) এবং আমি যে গ্রন্থ নাযিল করেছি (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এ গ্রন্থ তোমাদের উপর নাযিলকৃত গ্রন্থের সত্যতা বর্ণনাকারী (অর্থাৎ তওরাত যে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ তা সমর্থন করে এবং সত্যতা প্রমাণ করে। অবশ্য এতে পরবর্তীকালে পরিবর্তন সাধন করে যে কৃত্রিম ও অলীক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো মূল তওরাত ও ইঞ্জীলের অন্তর্ভুক্তই নয়। সুতরাং এ দ্বারা সেগুলোর [পরিবর্তন করার পর] সংযোজিত অংশের সমর্থন করা বোঝায় না) এবং কোরআনের প্রথম অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হয়ো না। (অর্থাৎ পরবর্তীকালে তোমাদেরকে দেখে যত লোক অস্বীকারকারী হতে থাকবে, তাদের মধ্যে তোমরাই হবে কুফর ও অস্বীকারপ্রসূত পাপের প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী। ফলত কিয়ামত পর্যন্ত সবার কুফর ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝা তোমাদের আমলনামাভুক্ত হতে থাকবে।) আর আমার শরীয়তের নির্দেশাবলীর বিনিময়ে তোমরা কোন নগণ্য বস্তু গ্রহণ করো না এবং বিশেষভাবে শুধু আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন করে অথবা গোপন করে সাধারণ জনমণ্ডলীর কাছ থেকে এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ দুনিয়া গ্রহণ করো না—যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যার বিশদ বিবরণ সামনে দেয়া হচ্ছে।) আর সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপনও করো না (কেননা সত্য গোপন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ** সূরা বাক্বারাহ্ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা শুধু মু'মিনগণই উপকৃত হবেন। এর পরে যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী ছিল সরাসরি কাফের ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের। উভয় শ্রেণীর যাবতীয় অবস্থা ও কুকীর্তির তালিকাসহ

বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মু'মিন, মুশরিক ও মুনাফিক—এই তিন শ্রেণীকে সম্বোধন করেই সবাইকে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা ও আরাধনার তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং কোরআন মজীদের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ঈমানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করে তাদের সম্মুখে নিজেদের মূল ভিত্তি ও প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্য ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাসমূহ সুস্পষ্ট-ভাবে বিবৃত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা ও আরাধনার প্রতি আগ্রহ এবং নাফরমানির ব্যাপারে চিন্তার উদ্রেক করে।

অতঃপর প্রকাশ্যে কাফের ও মুনাফিকদের যে দু'টি শ্রেণীর কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে—তাদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণী পৌত্তলিক মুশরিক-দের—যারা কেবল পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ করতো। তারা প্রাচীন ও আধুনিক কোন জ্ঞানেরই অধিকারী ছিল না। সাধারণত ওরা ছিল নিরক্ষর। যেমন, সাধারণ মক্কাবাসী। এজন্য কোরআন পাক এদেরকে 'উম্মিয়্যীন' ( নিরক্ষর ) বলে আখ্যায়িত করেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল তাদের, নবীগণের উপর যারা ঈমান এনেছিল এবং পূর্ব-বর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ; যথা—তওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতির জ্ঞানও তাদের ছিল। ফলে তারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে কতক হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি ঈমান না এনে মূসা (আ)-র উপর ঈমান এনেছিল। এদেরকে বলা হতো ইহুদী। আবার কতক হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি ঈমান রাখতো, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-কে নবী হিসেবে নিষ্পাপ বলে মনে করতো না। এদেরকে বলা হত 'নাসারা'। এরা আসমানী কিতাব তওরাত বা ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো বলে কোরআন এদের উভয়কে আহ্লে কিতাব ( গ্রন্থধারী) বলে আখ্যায়িত করেছে। এরা জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিল বলে সবাই তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করত ও আস্থার নজরে দেখত। এদের কথা সাধারণ মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। এরা সাবিকভাবে পথে এসে গেলে অন্যরাও মুসলমান হয়ে যাবে—এমন একটা আশাবাদ পোষণ করা হতো। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদের সংখ্যাই ছিল গরিষ্ঠ।

সূরা বাক্কারাহ্ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুশরিক ও মুনা-ফিকদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলীন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুষ্কৃতির জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব

বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনা ও সমাপ্তিপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ —( হে ইসরাঈলের বংশধর ) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ এখানে ইসরাঈল (اسرائيل) হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'আবদুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দাস)। ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম। কতিপয় ওলামায়ে-কেরামের মতানুসারে হুযুরে পাক (সা) ব্যতীত অন্য কোন নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল—হযরত ইয়াকুব (আ)-এর দু'টি নাম রয়েছে—ইয়াকুব ও ইসরাঈল। কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব ( بَنِيْ يَعْقُوْبَ ) বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা 'আবদুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্র আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাদের তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

'এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।' অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ্ (রা)-এর মতে তওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا

অর্থাৎ—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝ থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম ( সূরা মায়েদাহ্, ৩য় রুকু )। সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাঁদের মধ্যে আমাদের হুযুর পাক (সা)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া নামায, যাকাত এবং অন্যান্য সদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভুক্ত, যার মূল মর্ম হল রসূলে করীম (সা)-এর উপর ঈমান ও তাঁর পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণ অনুসরণ।

'আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।' অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্

এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে।

মূল বক্তব্য এই যে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর, তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করবো। আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।

**মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা ঃ** তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর যিক্‌র ও অনুসরণের আহ্‌বান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তাঁর দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্‌বান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ— (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব)। এখানে উম্মতে-মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন— একেবারে সরাসরি। এরা দাতাকে চেনে।

**অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা হারাম ঃ** এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লংঘন করা হারাম। সূরা মায়েদা'-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর)।

রসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানব জাতি সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে। এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

**পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ-পুণ্য লেখা হয় ঃ** أَوَّلَ كَافِرٍ— —যে কোন পর্যায়ে কাফের হওয়া চরম অপরাধ ও

জুলুম। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফেরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ সে-ই কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য এ অবিশ্বাসপ্রসূত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে।

**জ্ঞাতব্য ঃ** এতদ্বারা বোঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে পরিণত হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের সবার সমতুল্য পাপ তার একারই হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পুণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক সৎকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তাদের সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এ মর্মে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সা)-এর অগণিত হাদীস রয়েছে।

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত-সমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা—এ কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

**কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ঃ** এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কি না। এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাস'আলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনাসাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা—এ সম্পর্কে ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রসূলে করীম (সা) কোরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন যাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষক-মণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে

পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেকাহ্ শিক্ষা দান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআনশিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (দুররে-মুখতার, শামী)

**ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয ঃ** আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল-'আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহ্গণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার হবে। বস্তুত যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত।

**সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম ঃ**

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না)—এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ না-জায়েয। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

**খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবু হাযেম (র)-এর উপস্থিতি ঃ** 'মাসনাদে-দারেমি'-তে সনদসহ বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পর লোকদের জিজ্ঞেস করলেন যে, মদীনায় এমন কোন লোক বর্তমানে আছেন কি, যিনি কোন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন? লোকেরা বলল ঃ আবু হাযেম (র) এমন ব্যক্তি। খলীফা লোক মারফত তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তশরীফ আনার পর খলীফা বললেন, হে আবু হাযেম, এ কোন্ ধরনের অসৌজন্য-মূলক ও অভদ্রজনোচিত কাজ! হযরত আবু হাযেম বললেন, আপনি আমার মাঝে এমন

কি অসৌজন্য ও অভদ্রতা দেখতে পেলেন ? সুলায়মান বললেন, মদীনার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি। আবু হাযেম বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! বাস্তবতাবিরোধী কোন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে চিনতেন না; আমিও আপনাকে কখনো দেখিনি। এমতাবস্থায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অসৌজন্য কেমন করে হলো ?

সুলায়মান উত্তর শুনে ইবনে শিহাব যুহ্‌রী ও অন্যান্য উপস্থিত সুধীর প্রতি তাকালে পর ইমাম যুহ্‌রী (র) বললেন, আবু হাযেম তো ঠিকই বলেছেন ; আপনি ভুল বলছেন।

অতঃপর সুলায়মান কথাবার্তার ধরন পাল্টিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। বললেন, হে আবু হাযেম ! আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ি কেন ? তিনি বললেন, কারণ আপনি পরকালকে বিরান এবং ইহকালকে আবাদ করেছেন। সুতরাং আবাদী ছেড়ে বিরান জায়গায় যেতে মন চায় না।

সুলায়মান এ বক্তব্য সমর্থন করে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে কিভাবে উপস্থিত হতে হবে ? বললেন, পুণ্যবানগণ তো আল্লাহ্‌র দরবারে এমনভাবে হাযির হবেন, যেমন কোন মুসাফির সফর থেকে ফিরে নিজ বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়। আর পাপীরা এমনভাবে উপস্থিত হবে, যেমন কোন পলাতক গোলামকে ধরে নিয়ে মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়।

সুলায়মান কথা শুনে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ পাক আমার জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যদি তা আমি জানতে পেতাম। আবু হাযেম (র) এরশাদ করলেন, নিজের আমলসমূহ কোরআন পাকের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই তা জানতে পারবেন।

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কোরআনের কোন্ আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে ? বললেন, এ আয়াত দ্বারা ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

(নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ জান্নাতে সুখ-সম্পদে অবস্থান করবেন এবং অসৎ ও অবাধ্যজন নরকে।)

সুলায়মান বললেন, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা তো অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তা অবাধ্যদেরও পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বললেন ঃ

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের দয়া ও করুণা সৎকর্মশীলদের সন্নিকটে রয়েছে)। সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হাযেম! আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি শালীনতা ও মানবতাবোধ এবং বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কি? বললেন, হারাম বস্তুসমূহ পরিহার করে যাবতীয় ওয়াজিব পালন করা।

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দোয়া কোন্‌টি? এরশাদ করলেন, দাতার প্রতি দানগ্রহীতার দোয়া। আবার জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোৎকৃষ্ট দান কোন্‌টি? এরশাদ করলেন ঃ কোন প্রসঙ্গে নিজ কৃত দানের উদ্ধৃতি না দিয়ে বা কোন রকম কষ্ট না দিয়ে নিজের প্রয়োজন ও অভাব সত্ত্বেও কোন বিপদগ্রস্ত সায়েলকে (যাচ্‌নাকারীকে) দান করা।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কথা কোন্‌টি? বললেন, যার ভয়ে তুমি ভীত বা তোমার কোন প্রয়োজন বা আশা-আকাঙ্ক্ষা যার সাথে জড়িত তাঁর সম্মুখে নিঃসংকোচে ও নির্বিবাদে সত্য কথা প্রকাশ করা।

জিজ্ঞেস করলেন, সর্বাধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী মুসলমান কে? এরশাদ হল, যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত থেকে কাজ করে এবং অনুরূপভাবে অপরকেও করতে আহ্বান করে।

জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ কে? বললেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের অত্যাচারে সহযোগিতা করে। তার অর্থ হল এই যে, সে নিজের ধর্ম বিক্রি করে অপরের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে। সুলায়মান বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

অতঃপর সুলায়মান স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? আবু হাযেম বললেন, আপনার এ প্রশ্ন থেকে যদি আমাকে অব্যাহতি দেন, তবে অতি উত্তম। সুলায়মান বললেন, মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশবাক্য শোনান।

আবু হাযেম বললেন, আপনার পিতৃপুরুষ তরবারির দৌলতে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের উপর রাজত্ব করেছেন। আর

এতোসব কীর্তির পরও তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আফসোস! আপনি যদি জানতে পারতেন যে, তাঁরা মৃত্যুর পর কি বলেন এবং প্রতি-উত্তরে তাঁদেরকে কি বলা হচ্ছে!

অনুচরদের একজন খলীফার মেজাজবিরুদ্ধ আবু হাযেমের স্পষ্টোক্তি শুনে বলল, আবু হাযেম, তুমি অতি জঘন্য উক্তি করলে। আবু হাযেম (র) বললেন, আপনি ভুল বলছেন। কোন ন্যক্কারজনক কথা বলিনি, বরং আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দেশ রয়েছে তদনুসারেই কথা বলেছি। কারণ আল্লাহ্ পাক ওলামাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষকে সত্য কথা বলবে, কখনো তা গোপন করবে না। لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (যেন তোমরা যা সত্য, মানুষের নিকট তা প্রকাশ কর এবং তা গোপন না কর)।

ইমাম কুরতুবী এই সুদীর্ঘ ঘটনা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের সংশোধনের পথ কি? এরশাদ হল, গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন। নম্রতা ও শালীনতা গ্রহণ করুন এবং হকদারদের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন করে দিন।

সুলায়মান বললেন, আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন? আপত্তি করে আবু হাযেম বললেন, আল্লাহ্ রক্ষা করুন। সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কেন? তিনি বললেন, এ আশংকায় যে, পরে আপনাদের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি না আকৃষ্ট হয়ে পড়ি—পরিণামে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে!

অতঃপর খলীফা বললেন, আপনার যদি কোন অভাব থাকে, তবে মেহেরবানী করে বলুন—তা পূরণ করে দেব। এরশাদ হল, একটি প্রয়োজন আছে, দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। খলীফা বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়। বললেন, তাহলে আপনার কাছে কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

পরিশেষে সুলায়মান বললেন, আমার জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন। তখন আবু হাযেম (র) দোয়া করলেন, আল্লাহ্! সুলায়মান যদি আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মঙ্গল ও কল্যাণ সহজতর করে দিন। আর যদি সে আপনার শত্রু হয়ে থাকে, তবে তার মাথা ধরে আপনার সন্তুষ্টি বিধান ও অনুমোদিত কার্যাবলীর দিকে নিয়ে আসুন।

খলীফা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন, সারকথা এই যে, আপন পালনকর্তাকে এত বড় ও প্রতাপশালী মনে করুন যে, তিনি যেন আপনাকে এমন স্থানে

বা অবস্থায় না পান, যা থেকে বারণ করেছেন এবং যেদিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যেন অনুপস্থিত না দেখেন।

এ মজলিস থেকে প্রস্থানের পর খলীফা আবু হাযেম (র)-এর খেদমতে উপঢৌকনস্বরূপ এক শ' গিনি পাঠিয়ে দিলেন। আবু হাযেম (র) একখানা চিঠিসহ তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "এই এক শ' গিনি যদি আমার উপদেশাবলী ও উপস্থাপিত বক্তব্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে আমার নিকট এগুলোর চাইতে রক্ত ও শূকরের মাংসও প্রিয়। আর যদি সরকারী ধনভাণ্ডারে আমার অধিকার ও প্রাপ্য আছে বলে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার ন্যায় দ্বীনী খেদমতে ব্রতী হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন। যদি তাঁদের সবাইকে সমসংখ্যক গিনি প্রদান করে থাকেন, তবে আমিও গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।"

আবু হাযেম (র) উপদেশ বাক্যের বিনিময় গ্রহণকে রক্ত ও শূকরের সমতুল্য বলে মন্তব্য করার ফলে এ মাস'আলার উপরও আলোকপাত হয়েছে যে, কোন ইবাদত বা উপাসনার বিনিময় গ্রহণ করা তাঁদের মতে জায়েয নয়।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়। (৪৪) তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৪৫) ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর তোমরা (মুসলমান হয়ে) নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর এবং বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর, (বনী-ইসরাঈলের পুরোহিতদের কোন কোন আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যখন এদের সাথে কথাবার্তা হত, তখন গোপনে এসব পুরোহিত তাঁদেরকে বলতো যে, মুহাম্মদ [সা] নিঃসন্দেহে সত্য রসূল। আমরা তো বিশেষ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হচ্ছি না। তোমরা কিন্তু ইসলাম ধর্ম ছেড়ো না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক বলেন, একি মারাত্মক কথা যে,) তোমরা অপর লোককে সৎকাজ করতে আদেশ কর, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বসেছো। বস্তুত তোমরা কিতাব পাঠ করতে থাক (অর্থাৎ তওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমল-হীন পুরোহিতদের নিন্দাবাদ পাঠ কর)। তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না? এবং তোমরা সাহায্য কামনা কর (অর্থাৎ ধন-লিপ্সা ও মর্যাদার মোহে পড়ে তোমাদের নিকট ঈমান আনা যদি কঠিন বোধ হয়, তবে সাহায্য প্রার্থনা কর). ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। (অর্থাৎ ঈমান এনে ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্য করণীয় হিসেবে গ্রহণ কর। তখন সম্পদের লিপ্সা ও মর্যাদার মোহ অন্তর থেকে সরে যাবে। এখন যদি কেউ বলে, ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্যকরণীয়রূপে গ্রহণ করাও কঠিন কাজ, তবে শুনে নাও) এবং বিনয়ী ও বিনম্রগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে এ নামায নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর বিনয়ী তারাই, যারা মনে করে যে, নিঃসন্দেহে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং নিশ্চয়ই তারা তাঁর নিকটে ফিরে যাবে (এবং সেখানে তাদের হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে। এরূপ দ্বিবিধ ধারণা পোষণের ফলে আগ্রহ ও ভয় উভয়ই সঞ্চারিত হবে এবং এ দুটি বস্তুই প্রতিটি আমলের প্রাণ)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ** বনী-ইসরাঈলকে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান করছেন। পূর্ববর্তী তিন আয়াতে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখন আলোচ্য চার আয়াতে সৎকার্যাবলীর নির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমলের বর্ণনা রয়েছে। আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য এই যে, যদি ধন-লিপ্সা ও যশ-খ্যাতির মোহে তোমাদের পক্ষে ঈমান আনা কঠিন বোধ হয়, তবে তার প্রতিবিধান এই যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। এতে ধন-লিপ্সা হ্রাস পাবে। কেননা ধন-সম্পদ মানবের কামনা-বাসনা ও ভোগ চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই তা তাদের নিকট এত প্রিয় ও কাম্য। যখন বল্গাহীনভাবে এ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতাও থাকবে না এবং এর প্রতি কোন মোহ কিংবা আকর্ষণও এত প্রবল হবে না, যা নিজস্ব লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে একেবারে অন্ধ করে দেয়। আর

নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির মোহ হ্রাস পাবে। কারণ নামাযে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকম বিনয় ও নম্রতাই বর্তমান। যখন সঠিক ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন যশ ও পদ-মর্যাদার মোহ এবং অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হ্রাস পাবে। সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতির মোহই ছিল অশান্তির প্রধান উৎস। যে কারণে ঈমান গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যখন এ অশান্তির উপাদান হ্রাস পাবে, তখন ঈমান গ্রহণ করাও সহজতর হয়ে যাবে।

ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন--পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিনরাতে পাঁচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু হতে ধৈর্য ধারণ করার নাম নামায।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়। কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচীর অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্ত যথাযথভাবে পালন এবং এ সব সময়ে প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলনও কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে নামায সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা। নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

মোটকথা, নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্য বাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

মোটের উপর নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে

পারে خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলত سكون قلب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হবে ঃ মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায় ? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব, বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু এক সময় বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই হৃদয় থেকে বেরিয়ে যাবে। এজন্য خشوع বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ সম্ভব হবে। আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহংকার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে। কি চমৎকার সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক চিকিৎসালয় !

এখন উল্লিখিত ভাব ও চিন্তার বর্ণনা এবং তা শিক্ষা প্রদান এভাবে করেছেন, আর বিনয়ী তারা যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ করবে এবং সে সময় এ খেদমতের উত্তম ও যথোচিত পুরস্কার লাভ করবে। তাছাড়া এ ধারণাও পোষণ করে যে, তারা যখন স্বীয় পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে, তখন এর হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে।এ দু'ধরনের চিন্তা দ্বারা رغبت ورهبت (আসক্তি ও ভীতি) সৃষ্টি হবে। যে কোন সচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে মন সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, বিশেষত সৎকাজে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে رغبت و رهبت-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

صَلٰوة — اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ—এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সেই বিশেষ ইবাদত, যাকে নামায বলা হয়। কোরআন করীমে যতবার নামাযের তাকীদ দেওয়া হয়েছে—সাধারণত اقامت শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য اقامت صلوٰة (নামায প্রতিষ্ঠা)—এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত।اقامت-এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণত যেসব খুঁটি দেওয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো

থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য اقامت স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় اقامت صلوٰة অর্থ—নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম রক্ষা করে নামায আদায় করা। শুধু নামায পড়াকে اقامت صلوٰة বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اقامت صلوٰة (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কোরআন করীমে আছে— اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয়ই নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে)।

নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাযীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। اٰتُوا الزَّكٰوةَ আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম—পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম-পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলদের উপরই ফরয ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াত—

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ۔

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ্ পাক বললেন, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

رُكُوْع — وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝোঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝোঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই—'রুকুকারিগণের সাথে রুকু কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকুকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন কোরআন মজীদের এক জায়গায় قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ফজর নামাযের কোরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সিজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাক'আত বা গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযীদের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি।

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رٰكِعِيْنَ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণকে বোঝানো হবে, যাতে রুকুও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর।

**নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ঃ** নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারা বোঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (রুকু-কারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন্ ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজেব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবী তো শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেই মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলীল। এতদ্ভিন্ন কতক হাদীস দ্বারাও জামাত ওয়াজিব বলে বোঝা যায়। যেমন— لا صلوٰة لجار المسجد الا فى المسجد (মসজিদের প্রতিবেশিগণের নামায মসজিদ ভিন্ন কোথাও জায়েয নয়।) আর মসজিদের নামায অর্থ যে জামাতের নামায

এটা সুস্পষ্ট। সুতরাং শব্দগতভাবে হাদীসের অর্থ এই যে, মসজিদের নিকটস্থ অধিবাসীদের নামায জামাত ব্যতীত জায়েয নয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধ সাহাবী হুযুর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমাকে মসজিদে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে—আমার সাথে এমন লোক নেই। যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে ঘরে বসেই নামায পড়বো। হুযুর (সা) প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ী থেকে আযান শোনা যায় কি? সাহাবী (রা) আরয করলেন, আযান তো অবশ্যই শুনতে পাই। হুযুর (সা) বললেন, তাহলে তোমার জামাতে শরীক হওয়া উচিত। অন্য রেওয়ায়েতে আছে—তিনি বললেন, তাহলে তোমার জন্য অন্য কোন সুযোগ বা অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা) এরশাদ করেছেন من سمع النداء فلم يجب فلا صلواة له الا من عذر (কোন ব্যক্তি আযান শোনার পর শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত যদি জামাতে উপস্থিত না হয়, তবে তার নামায হবে না)। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবূ মূসা আশ'আরী প্রমুখ সাহাবী (রা) ফতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের এত নিকটে থাকে, যেখান থেকে আযানের আওয়ায শোনা যায়, শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সে যদি জামাতে শরীক না হয়, তবে তার নামায আদায় হবে না। (আওয়ায শোনার অর্থ—মধ্যম ধরনের স্বরের অধিকারী লোকের আওয়ায যেখানে পৌঁছাতে পারে। যন্ত্র বর্ধিত আওয়ায বা অসাধারণ উঁচু আওয়ায ধর্তব্য নয়)।

এসব রেওয়ায়েত জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণের স্বপক্ষে দলীল। কিন্তু অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী। কোরআন করীমে বর্ণিত وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর) أَمْرٌ (নির্দেশ)-কে এসব বিশেষজ্ঞগণ অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে তাকীদ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদের নিকটে বসবাসকারীদের নামায জামাত ব্যতীত আদায় হয় না—তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করেছেন যে, এ নামায পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতই যথেষ্ট। সেখানে একদিকে যেমন জামাতের তাকীদ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা রয়েছে, সাথে সাথে এর মর্যাদার ও স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তা 'সুনানে হুদা'র পর্যায়ভুক্ত, যাকে ফকীহগণ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কেউ যদি রোগ-ব্যাধি

প্রভৃতি কোন শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া জামাতে শরীক না হয়ে একাকী নামায পড়ে নেয়, তবে তার নামায হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ছেড়ে দেওয়ার দরুন সে শাস্তিযোগ্য হবে। অথচ যদি জামাত ছেড়ে দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তবে মস্ত বড় পাপী হবে। বিশেষত যখন এমন অবস্থা হয় যে মানুষ ঘরে বসে নামায পড়ে মসজিদ বিরাণ হতে থাকে, তখন এরা সবাই শরীয়তানুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে। কাজী 'আয়ায' (র) বলেছেন যে, এসব লোককে বোঝানোর পরও যদি ফিরে না আসে, তবে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে।

**আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা ঃ** أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস)। এ আয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ থেকে বোঝা যায় ইহুদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত।) নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সা) এরশাদ করেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কারা? জিবরাঈল বললেন—এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না। (কুরতুবী)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কিভাবে দোযখে প্রবেশ করলে অথচ আল্লাহ্র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

**পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কি না ঃ** উল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে

উপদেশ দান করা জায়েয নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না, এমন কোন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন তবলীগকারীই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (রা) এরশাদ করেছেন—শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূল কথা এই যে, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?) আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশ দানকারী (ওয়ায়েজকে) আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয়—এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (সা) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

**দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার ঃ** সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি, যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই

নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল ঃ

(১) অর্থ গৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার সম্পদ জাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না।

(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঃ তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উৎপত্তি হয়।

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যম পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোন কথা মেনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদ লাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্ট করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহংকার, স্বার্থান্বেষী, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত মানবেতর সমাজবিরোধী ও নৈতিকতাবিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কোরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে—বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।) অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা সম্পদ

বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যম পন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এত প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দেবে।

আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাযের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। যখন যথানিয়মে ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

**বিনয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ** إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ( কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয় )। কোরআন ও সুন্নাহ্র যেখানে خشوع বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারকতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি। এর ফলে ইবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্-ভীতি ও নম্রতা না থাকে, তবে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও পছন্দনীয় ও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রা) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা ওঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান কর।'

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রা) বলেন যে, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خشوع বা বিনয় অর্থ حق বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন, তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া।

সারকথা—ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণামাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

**জ্ঞাতব্য ঃ** خشوع-এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خضوع ও ব্যবহৃত হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায়ও তা রয়েছে। এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خشوع শব্দ মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়—যখন তা কৃত্রিম হবে না, বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফল স্বরূপ হবে। কোরআন করীমে আছে خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ (শব্দ নীচু হয়ে গেল।) এবং خضوع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ (অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।

**নামাযে বিনয়ের ফেকাহ্‌গত মর্যাদা ঃ** নামাযে خشوع বিনয়ের তাকীদ বারবার এসেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর)। এবং একথা স্পষ্ট যে, غفلت (অমনোযোগিতা) স্মরণের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে غافل (অমনোযোগী) সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। রসূলুল্লাহ্ (সা) এরশাদ করেছেন ঃ নামায বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতা-বোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে ---যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামায পড়ে, সে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (র) উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্য উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে, خشوع বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা), সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (র)—প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় ও অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে খুশু নামাযের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাযের রূহ্ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নামাযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু ( خشوع ) বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব লাভ করবে না, যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ্ অনুযায়ী তাকে নামায পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তি বিধানও করা যাবে না। কারণ ফকীহ্‌গণ মানসিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিবেচনা করে হুকুম প্রয়োগ করেন না, বরং তাঁরা নিছক বাহ্যিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে হুকুম বর্ণনা করেন। কোন কাজের সওয়াব পরকালে পাবে কি পাবে না একথা ফেকাহ্‌শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ই নয়। সুতরাং যেহেতু অভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে হুকুম প্রয়োগ করা তাঁদের আলোচনাবহির্ভূত এবং খুশু (বিনয়) একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা। সুতরাং তাঁরা খুশুকে সম্পূর্ণ নামাযের জন্য শর্ত নির্ধারণ করেন নি, বরং খুশুর ন্যূনতম পর্যায়কে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। আর তা হল এই যে, কমপক্ষে তকবীরে-তাহরীমার সময় তা যেন বিদ্যমান থাকে।

খুশুকে গোটা নামাযে শর্ত নির্ধারণ না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে শরীয়তী বিধান প্রয়োগের সুস্পষ্ট নীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের জন্য এমন কোন কাজ ফরয করা হয়নি, যা তার ক্ষমতা ও সাধ্যের অতীত। পুরো নামাযের খুশু বজায় রাখা কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধ্যাতীত দায়িত্ব আরোপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পুরো নামাযের স্থলে কেবল নামাযের প্রারম্ভিক স্তরে খুশুকে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

**খুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়ঃ** সবশেষে 'খুশু'র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাযীও সম্পূর্ণভাবে নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক, সে অন্তত ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র প্রতি নিয়োজিত করেছে। কেননা, কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্ পাকেরই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাযে অন্তত এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাযীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

কিন্তু তা না হলে অন্যমনস্কদের অবস্থা পরিত্যাগকারীদের চাইতেও করুণ ও নিকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেননা যে গোলাম প্রভুর খেদমতে উপস্থিত থেকেও তার

প্রতি অমনোযোগী থাকে এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে, তার অবস্থা যে গোলাম আদৌ খেদমতে হাযির হয় না তার চাইতে অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক।

সারকথা, এটা আশা ও নিরাশার ব্যাপার ; এতে শাস্তির আশংকাও রয়েছে, পুরস্কারের আশাও রয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

**(৪৭) হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের ওপর করেছি এবং ( স্মরণ কর ) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর। ৪৮) আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

হে ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর! তোমরা আমার প্রদত্ত সেসব নেয়ামতের কথা স্মরণ কর ( যাতে কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা-আরাধনার প্রেরণা সৃষ্টি হয় ) এবং এ কথাও স্মরণ কর যে, আমি তোমাদেরকে ( বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ) বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ( এর অর্থ এও হতে পারে 'এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্ট জগতে এক বিরাট অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি )।

**জ্ঞাতব্য ঃ** এ আয়াতে যেহেতু হুযুর (সা)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং সাধারণত যে অনুকম্পা ও সম্মান পিতৃপুরুষের ওপর প্রদর্শন করা হয়, তদ্দ্বারা তার পরবর্তী বংশধরগণও উপকৃত হয়। এটাই সাধারণভাবে দেখা যায়। এজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারাও এ আয়াতের সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। আর এমন

একদিন সম্পর্কে ভয় কর, যেদিন কোন ব্যক্তি কারো পক্ষে কোন দাবী আদায় করতে পারবে না এবং কারো কোন সুপারিশও গৃহীত হবে না। (যার সম্পর্কে সুপারিশ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি ঈমান না থাকে)। আর কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কারো পক্ষপাতিত্বও করা যাবে না।

**জ্ঞাতব্য ঃ** আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কিয়ামতের দিন। দাবী আদায় করে দেওয়ার অর্থ---যেমন, কেউ নামায-রোযা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেওয়া। এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর পক্ষপাতিত্বের রূপ এই যে, কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সাহায্য করে কাউকে জোরপূর্বক উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে, ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم
بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

**(৪৯) আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহাপরীক্ষা।**

**তফসীরের সার সংক্ষেপ**

(ওপরে যে বিশেষ আচরণের বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখান থেকে তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। প্রথম আচরণ ও ঘটনা এই) আর সে সময়ের কথা

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের (পিতৃপুরুষদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম) যারা (সর্বক্ষণ) তোমাদেরকে (মানসিক কষ্ট) ও কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকত, আর তোমাদের পুত্র-সন্তানদের গলা কেটে মেরে ফেলত এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত, (যাতে তারা পূর্ণ বয়স্কা মহিলার পর্যায়ে পৌঁছে)। বস্তুত এই (ঘটনার) মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছিল।

**জ্ঞাতব্য ঃ** কোন ব্যক্তি ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরাউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়ত, এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সেই স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে অথবা বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বোঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ
أَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

**(৫০) আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। (৫১) আর তখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির, অতঃপর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুত তোমরা ছিলে জালেম।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদের (পথ বের করার) উদ্দেশ্যে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিলাম। অতঃপর আমি তোমাদেরকে (ডুবে মরার হাত

থেকে) উদ্ধার করলাম এবং ফেরাউনসহ তার সহচরদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। অথচ তোমরা স্বচক্ষে দেখছিলে।

**জ্ঞাতব্য ঃ** এ ঘটনা ঐ সময় ঘটে যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণের পর নবুয়ত লাভ করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত ফেরাউনকে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু সে কোনক্রমেই যখন সঠিক পথে আসল না, তখন হুকুম হল যে, বনী ইসরাঈলসহ গোপনে তুমি এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এমন সময় ফেরাউন পেছন দিক থেকে সসৈন্যে সেখানে এসে পৌঁছল। আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বনী-ইসরাঈলরা পথ পেয়ে পার হয়ে গেল। ফেরাউনের আগমন পর্যন্ত সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়েই রইলো। সেও পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে সেপথেই ঢুকে পড়লো। এমন সময় দু'দিক থেকে পানি চেপে এল এবং সমুদ্র পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ফলে সপারিষদ ও সসৈন্যে ফেরাউনের সলিল সমাধি ঘটল।

আর (ঐ সময়টির কথাও স্মরণ কর,) যখন আমি মূসা (আ)-র সাথে (তওরাত অবতীর্ণ করার নির্দিষ্ট সময়ান্তে সে নির্ধারিত সময়ের সাথে আরো দশ দিন বর্ধিত করে সর্বমোট) চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম। মূসা (আ)-র (প্রস্থানের) পর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে (পূজার ব্যবস্থা করে) নিলে এবং তোমরা (এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রকাশ্য) জুলুমে (সীমালংঘনে) দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিলে (অর্থাৎ এক অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার সমর্থক ও বিশ্বাসী হয়েছিলে)।

**জ্ঞাতব্য ঃ** এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল—আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল—তখন মূসা (আ)-র খেদমতে বনী-ইসরাঈলরা আরয করল ঃ আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেব। মূসা (আ)-র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন ঃ তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করব। মূসা (আ) তাই করলেন। ফলে তওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশদিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ) এক মাস রোযা রাখার পর ইফ্তার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বলে মূসা (আ)-কে আরো দশদিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মূসা (আ) তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন। এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আ)-এর

ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ায় সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী-ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

**(৫২) অতঃপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

তবুও আমি (তোমাদের তওবার পরিপ্রেক্ষিতে) এত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম—এ আশায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

**জ্ঞাতব্য ঃ** এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর আশার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ এই যে, মাফ করে দেওয়া এমনই এক জিনিস, যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

**(৫৩) আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি মূসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী নির্দেশাবলী দান করেছিলাম ---যেন তোমরা (সরল ও সঠিক) পথে চলতে পার।

**জ্ঞাতব্য ঃ** মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝানো হয়েছে—